“গীতারত্ন” শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ প্রবর্তিত ধর্ম ও জাতীয়তাবাদী বাংলা মাসিক পত্রিকা (৬৬ তম বর্ষ)

পার্থসারথি

(মুদ্রণ : জুন, ১৯৬০ থেকে মার্চ, ২০২০ / অন্তর্জালে প্রকাশ : এপ্রিল, ২০২০ থেকে)

Website: https://www.parthasarathipatrika.com

৬৮তম অন্তর্জাল সংখ্যা

৭ই অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ / ২৪.১১.২০২৫

—: সম্পাদক :—

সুনন্দন ঘোষ

-: সূচীপত্র :-

(৬৮তম অন্তর্জাল সংখ্যা)

গীতার শিক্ষা	শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ
আত্মকথা	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
শ্রীচৈতন্য-বাণী-আচরণে ও বচনে	ডঃ রুহিদাস সাহা
বাসনা বিদায়	অনিলবরণ
রাখে হরি মারে কে?	শ্রীমতী বাণীপ্রভা মালব্য
দেওয়া নেওয়া	শ্রী রাধাবল্লভ দে
দীঘায় শিক্ষক সম্মেলন	শ্রী অরূপ কুমার ভট্টাচার্য
স্বগতোক্তি	শ্রী সুনন্দন ঘোষ

Founded by Sri Priti Kumar Ghosh in June, 1960, PARTHASARATHI Bengali Monthly Magazine, RNI 5158/ 60, published in print format for sixty years, thereafter converted to e-magazine by Sri Sunandan Ghosh, Editor & Publisher in April, 2020 during prolonged Nationwide Lockdown and to be published in the Website: https://www.parthasarathipatrika.com

Contact: 182 Jessore Road, Flat- D/1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 8910977590.

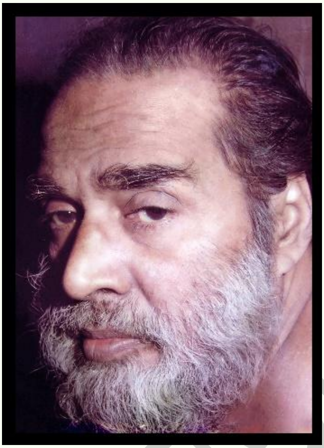

(১০ই মার্চ, ১৯২৬ – ২৪শে নভেম্বর, ১৯৮৬)

গীতার শিক্ষা **শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ**

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা সর্বোপনিষদের সার। আমাদের উপনিষদগুলি প্রাচীন ভারতীয় মনীষার চরম উৎকর্ষের নিদর্শন। আর ভগবদ্‌গীতা তারই সার-সংক্ষেপ – সর্বশাস্ত্রের নির্যাসস্বরূপ। গীতা একাধারে ব্রহ্মসঙ্গীত ও জীবন সঙ্গীত। গীতোক্ত ধর্ম সার্বভৌমিক, সার্বজনীন ও সার্বকালিক। গীতার শিক্ষা বিশ্বলৌকিক, পুণ্যময় ও কল্যাণময়। গীতার মাধ্যমে মানুষের মাহাত্ম্যই বিঘোষিত হয়েছে। গীতায় ব্যক্ত হয়েছে জীবনদর্শন, যে দর্শন একান্ত বাস্তবানুগ, সার্বজনীন ও জীবনভিত্তিক। কর্মময় জীবনের উদ্দেশ্যও বিধৃত হয়েছে এতে। অর্জুনের সমস্যা কোন বিশেষ লোক বা বিশেষ কালের সমস্যা নয়, এই সমস্যা সর্বকালীন মানুষের দ্বন্দ্বময় জীবনের সমস্যা। সমস্যা সংকুল জীবনের পদে পদে দ্বিধাগ্রস্ত মানুষের অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর যেমন পাওয়া যাবে গীতায়, তেমনি জ্ঞান ও ভক্তির মাধ্যমে আত্মোপলব্ধি ও মানবতার উপলব্ধির সম্যক পথের সন্ধান আমরা পাব গীতার দর্শনে। প্রেম, সত্য, সংযম, সহিষ্ণুতা, একাগ্রতা, নিঃস্বার্থ-পরতা প্রভৃতি সর্বোচ্চ আদর্শের বাণী গীতার মাধ্যমে

প্রচারিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, গীতার শিক্ষায় আমরা পাই সংসার সমরে ধর্মরক্ষা ও জগত কল্যাণের জন্য ক্লীবতা ও হৃদয় দৌর্বল্য ত্যাগ করে শৌর্য, বীর্য প্রকাশের মহা আহ্বান।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য এবং সত্য ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনবোধে তেজ, শক্তি, সাহস ও বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের প্রয়োজন আছে। প্রতিটি মানুষের জীবনে থাকা চাই সাহসিকতা, তেজস্বিতা ও বীর্যবত্তা; সেই সঙ্গে যুক্ত হওয়া চাই ধর্মবোধ ও নৈতিক চেতনা। গীতা ঈশ্বরকেন্দ্রিক। গীতা কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানযোগ ভিত্তিক। জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি – এগুলির প্রত্যেকটিরই পথ ও প্রণালী ভিন্ন, কিন্তু লক্ষ্য এক ও অদ্বিতীয় – ঈশ্বরোপলব্ধি। ঈশ্বর পরম পুরুষ, পুরুষোত্তম। তিনি সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ। সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ। কর্ম–ভক্তি–জ্ঞান যোগ এগুলির সমন্বয়ে অথবা যে কোন একটির মাধ্যমেই মানবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মহামিলন সঙ্ঘটিত হয়। গীতার অবতার তত্ত্ব অতি সুন্দর, ঈশ্বর যুগে যুগে এই মাটির পৃথিবীতে নেমে আসেন, মানবকল্যাণের জন্য, ধর্মসংস্থাপনের জন্য। ধর্মেই মানবের জীবন বিধৃত। তার আত্মিক চেতনা ও আধ্যাত্মিক অগ্রগতি লাভের বাহন ধর্ম। ধর্মই জীবনকে সুন্দর সৎ ও আনন্দময় করে।

গীতায় কোন মত ও পথের মধ্যে দ্বন্দ্ব বা বিরোধ নেই। সকল ধর্মপথ ও দর্শনের মহাসমন্বয়ের সূত্র রয়েছে গীতার বাণীতে। গীতায় কর্মময় জীবনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অবিরাম কর্ম করার নির্দেশ রয়েছে। কর্মই জীবন। কর্মহীন জীবন মৃত্যুর নামান্তর মাত্র। জীবন নিত্য কর্মময়। কর্মই জীবনের নিয়ম। সর্বজীবে সমদৃষ্টি গীতার অন্যতম শিক্ষা এবং কর্মযোগীর কর্তব্য হল সর্বজীবের কল্যাণ সাধন। কর্মযোগীর জানা আবশ্যক কোনটা বিহিত বা যথার্থ বা কর্তব্য কর্ম। তাই প্রয়োজন কর্মকুশলতার। জীবন সংগ্রামে দাঁড়িয়ে আত্মীয়পরিজন পরিবৃত আমরা ষড় রিপুর তাড়নায় অবসাদগ্রস্ত, মোহাচ্ছন্ন, অজ্ঞানতাবশে অহংবোধে পরিতৃপ্ত, সত্যানুভূতি

থেকে বঞ্চিত। তাই শ্রীকৃষ্ণ নিষ্কাম কর্মের বাণী প্রচার করেছেন মুমুক্ষু মানুষের কর্মের বন্ধন দূর করার সোপান হিসাবে। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, কর্মের জন্যই কর্ম করা দরকার। নিঃস্বার্থ কর্মই অভিপ্রেত এবং পরিণামে উৎসাহব্যাঞ্জক। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে, গীতা অনাসক্ত হতে বলেছেন, ভিক্ষুক হতে বলেন নি। অনাসক্ত হতে হলে প্রেমের প্রয়োজন এবং আত্মসংযমই তা লাভের প্রকৃষ্ট উপায়। অনাসক্ত মানুষই পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভের অধিকারী। গীতার অনাসক্ত মানবই আদর্শ পুরুষ। এই আদর্শ মানব কাউকে ঘৃণা করেন না। সকলেই তার মিত্র। তিনি সকলের প্রতি তার করুণা প্রকাশ করেন। সুখে দুঃখে সমভাবাপন্ন, ধৈর্যশীল, অহংকারমুক্ত এবং সর্বদা কর্মযোগীর ভূমিকা পালন করেন। “আত্মানং বিদ্ধি”- আত্মাকে জানো, নিজেকে জানো। আত্মাকে জানতে হলে জ্ঞানের প্রয়োজন। জ্ঞান মানুষকে পথের সন্ধান দেয়। মননশীলতা মানুষের ধর্ম। মননশীলতা বুদ্ধির ক্রিয়া। মানুষ কর্ম করবে স্বীয় বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর করে। আত্মা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। মানুষের আত্ম নিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে গীতায়। স্বীকৃত হয়েছে কর্মের স্বাধীনতা, পুরুষকার। পুরুষকার হল সকল প্রকার শারীরিক শ্রম, অনুশীলিত প্রচেষ্টা বা কর্মের অক্ষুণ্ণ উদ্যম। পুরুষকার ছাড়া কোন কার্যসিদ্ধিই সম্ভবপর নয়। দৈব হল প্রারব্ধও। পূর্বজন্মের কর্মফল। দৈব ও পুরুষকার উভয়ের উপস্থিতি ঘটলে তবেই কর্মসিদ্ধি ঘটে।

কর্তব্যকর্ম বা অনুষ্ঠেয় কর্ম সম্পাদন প্রতিটি মানুষেরই অবশ্য কর্তব্য। এটা যেমন নিঃশর্ত নির্দেশ তেমন সার্বজনীন। তাই কর্ম হবে নিষ্কাম। ফললাভের আশা ত্যাগ করে ভক্তিভরে প্রেমের সাথে ও শ্রদ্ধা সহকারে স্বীয় কর্ম সম্পাদনের মধ্যে দিয়েই ব্যক্তিসত্তা উৎকর্ষ লাভ করে। কর্মসন্ন্যাসের অর্থ কর্মত্যাগ নয়, কর্মের ফল সম্পর্কে নিরাসক্ত চিত্ত হওয়া বা ফল ত্যাগ করা। ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা চালিত হয়ে যে কাজ করা হয় তা কেবল বন্ধন সৃষ্টি করে। গীতার কর্মের উদ্দেশ্যই হল, লোক সংগ্রহ ও সর্বভূতের হিত বা কল্যাণ সাধন। যে ব্যক্তি সর্বজীবের হিত সাধনে রত

থাকেন, তিনি সহজেই ঈশ্বর লাভ করেন। নিষ্কাম কর্মের মধ্য দিয়েই সামাজিক কল্যাণ সাধিত হয়।

মানুষের মনে জ্ঞান লাভের ইচ্ছা এবং ভাবাবেগ বা অনুরাগ বর্তমান। যে কারণেই কারো জ্ঞানে প্রবল আগ্রহ, কারো কর্মের ইচ্ছা প্রবল, কেউ বা অনুরাগ বা ভক্তিরসে আপ্লুত। গীতা এই তিনটি গুণেরই সমন্বয়ের সমার্থক। প্রকৃত জ্ঞানীই প্রকৃষ্ট কর্মী। পক্ষান্তরে, শ্রদ্ধা ছাড়া জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়। কর্ম-নিরপেক্ষ জ্ঞান অনভিপ্রেতও। অপরপক্ষে, ভক্তিশূন্য জ্ঞান আবার অহংবোধের সৃষ্টি করে। অহংবোধ কর্মের ক্ষেত্রে জাগিয়ে তোলে কর্তৃত্বাভিমান আর অনাসক্ত কর্মের পথে বিঘ্ন ঘটায়। ভক্তি থেকেই শ্রদ্ধা যেমন জাগ্রত হয়, তেমন অহং দূর হয় আর সেই সাথে ত্যাগের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। সহনশীলতা মানুষের প্রকৃষ্ট গুণ। গীতা মানুষকে সহনশীল, আত্মসংযমী ও যোগী হতে বলেছেন। গীতায় মানসিক পবিত্রতার উপর সবচাইতে জোর দেওয়া হয়েছে। গীতায় ত্যাগ ও ভোগ, জ্ঞান ও কর্ম, প্রেম ও ভক্তির মহামিলনে মানবজীবন হয়েছে আদর্শ মানবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। গীতার জীবন সঙ্গীত শাশ্বত সমন্বয় সঙ্গীত। ভ্রাতৃত্ব ও সেবার মধ্য দিয়ে এনে দেয় জীবনে ঐকতানের সুর ও গতিময়তা, জীবন হয়ে ওঠে গীতাময়। দ্বন্দ্বময় ব্যক্তিজীবনে ও সংঘাতময় সমাজজীবনে গীতাই আমাদের এনে দিতে পারে সুখ, শান্তি, আনন্দময় জীবন ও পবিত্রতা।

“জয়তু পার্থসারথি”

আত্মকথা **শুক্লা ঘোষ**

শ্রী প্রীতিকুমারের জন্মদিন পালিত হল। সকাল থেকে বাড়ীতে কতজনের আনাগোনা। বাড়িটা ফুলে ধূপে সুরভিত হয়ে ছিল। এবার গান গাইবার জন্য যে কতজন তৈরি ছিল তা বলবার নয়! আমার সবচেয়ে ভালো লাগলো যখন মলি খুব স্বাভাবিক ভাবেই একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলো। এবার সঙ্গীতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিল অপু – শ্রীমান অপূর্ব ভাজন। শিল্পীকে আনা নেওয়ার দায়িত্ব সে নিজেই নিয়েছিল। আমি আর কি করতে পারি? তাকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করতে পারি। মামণি যে অনুষ্ঠান সা পা টিপে শুরু করেছিল সেটা শেষ হল বেশ রাত্রে। তার মাঝখানে শ্রীমতী রীতা যে ক'টি গান গাইলো – মুগ্ধ হয়ে শোনবার মতো। যেমন তার গলা, তেমনি তার গায়কী। কেয়া তার জামাইবাবুর জন্মদিনে এবার রীতার গানের উপহার সাজিয়ে দিয়েছে। আমরা আবার সামনের বছরের দিকে তাকিয়ে থাকবো। পরের বারের জন্য নীরেনদাকে আগে থাকতে অনুরোধ করে রাখছি। বারবার তো শরীর খারাপ হলে চলবে না! শ্রীপ্রীতিকুমার তো আমার একার নন, সকলের। আমাদের সকলকেই সচেষ্ট থাকতে হবে। কিশোরের বোন কৃষ্ণাও এসেছিল সেই সুদূর বেহালা থেকে। সে আরও মন দিয়ে গাইতে পারতো যদি তার ছেলেটা আরেকটু সদয় হত। আধঘণ্টার উপস্থিতিতে তার খাওয়া, বমি, হাগুমুতু সব হয়ে গেল। আজকালকার বাচ্চাদের দেখলে আমার খুব বুক ধড়ফড় করে। সকলেরই সাকুল্যে একটা বা দুটো ছেলেমেয়ে। বাবা-মায়েরা তাদেরই ডাক্তার করে, তাদেরই ইঞ্জিনিয়ার করে, তাদেরই ব্যারিষ্টার করে, নতুবা চার্টাড একাউন্ট্যাণ্ট। তার উপর সিলেবাসের পাহাড়। শিশুগুলি ঐ বিশাল ব্যাগ বয়ে মা-বাবার কচকচানি শুনতে শুনতে অকালপক্ক হয়ে ওঠে। বড়দের কথার মধ্যে বসে থাকা, বড়দের কথা বলবার সময় তাদের নিজেদের বক্তব্য পেশ করা, এসব খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। আমাদের বাড়ীতেও দু'টি শিশু ছিল। শ্রীপ্রীতিকুমার তাদের নিয়ে এত ব্যস্ত থাকতেন যে আমরা চিন্তা করে ঠিক করে উঠতে পারিনি তারা কি হবে। তবে তারা ভদ্র সভ্য ছিল। কাঁদুনে বাচ্চা একেবারেই ছিল না। ছেলেটি হাতে পায়ে দুরন্ত ছিল। আমাকে মাঝে

মাঝে তাকে একটু শাসন করতে হয়েছে। আমার মনে হয় তারাও দু'টি ভাই-বোন খুব ভদ্র সভ্য ভাবেই বড় হবে।

আমাদের বাড়ীতে আরেকজন এসেছেন। তিনি তার পূর্বসূরীদের মতো মোটেই শান্ত নন। তার হাত পা চালানো দেখলে আমার অ্যাকোরিয়ামে রাখা টাইগার শার্ক-এর কথাই মনে হয়। এক মুহূর্ত স্থির থাকে না। আমার মনে হয়, অত যে অন্য বাচ্চাদের শাসন করি, বাড়ীরটি দুষ্টু হলে কি করবো? মনে হয় হবে না। তবে বাবারা আবার বৃদ্ধকালের সন্তানের প্রতি অতিরিক্ত দুর্বল হয়ে পড়ে তো!

তবে আজকাল সব বাচ্চাকে শাসন করা যায় না। দু'দিন পরে আমার পুত্তরই হয়তো বলবেন তার মেয়ের সম্বন্ধে আমার বেশী ভাবনা চিন্তা করবার দরকার নেই। তবে একটা কথা আমি স্বীকার করতে বাধ্য এখনও দয়া করে বাচ্চাটিকে আমার কাছে রাখে। না দিলেই বা কি করতাম? আমার তো কোনও জোর নেই। একটা কথা অবধারিত সত্য, আমাদের সমাজে যে মহিলার স্বামী না থাকে, সে জীবনে অনেক প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত থাকে। সংসারে সমস্ত কাজ করে, সমস্ত অর্থ ব্যয় করেও সে একপেশে হয়ে যায়। শ্রীপ্রীতিকুমার আমার স্বাধীনতায় কখনও হস্তক্ষেপ করেন নি, আমার পড়াশুনোয় বাধা দেন নি, আমার পাহাড় পর্বতে অভিযানে দু'হাতে টাকা খরচ করেছেন, তবু আমার জন্য তাঁর ভীষণ চিন্তা ছিল। আমাকে তিনি ছেলেমানুষ মনে করতেন। ফলে আমারও ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে কতকগুলি গুণ বিকশিত হয় নি। নির্ভরশীল হয়ে গেছি। স্বাধীনভাবে কিছু করতে গেলে হোঁচট খাই। নিজের জন্য কাউকে আবেদন করতে ইতস্ততঃ করি। ফলে কর্মক্ষেত্রে সবাই ভাবেন আমার কোনও কিছু প্রয়োজন নেই। আমারও আর কাউকে 'দাদা' 'দাদা' করে buttering করতে হয় না।'

শ্রীপ্রীতিকুমার আমাকে আশ্রয়হীন করে যাননি। তাঁর যে ভক্ত ও বন্ধু আছেন, তাঁরা আমায় যে কোনও অবস্থায় সাহায্য করে থাকেন, এবং সকলে আমার উপকারই করেছেন। তবু আমরা সবাই সেই শ্রীপ্রীতিকুমারের আশ্রিত। অনেকে তাঁর উপর অভিমান করে, তাঁর হঠাৎ চলে যাওয়াটা মেনে নিতে পারেনা। শুধু ভাবি,

আমি যে তাঁর এত পছন্দের স্ত্রী, এত ভালবাসতেন, স্নেহ করতেন, আমাকে কেন এই বিশাল সমস্যা ও বিপদের মধ্যে রেখে গেলেন? বিপদ তবু কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলাম। কিন্তু যাকে অতি আদরে লালন পালন করে বড় করে তুলেছি সে কেন মাঝে মাঝে নিজের ব্যক্তিত্ব ক্ষুণ্ণ হচ্ছে আশঙ্কা করে দু'চারটা কটু বাক্য বর্ষণ করে বসে? মনে হয় এটাই সংসারের ধর্ম। মানবজীবনের ধর্মে সব প্রাপ্তি তো গ্রহণযোগ্য।

আমি বোকা। দু'চারটে উত্তর দিয়ে বিষয়গুলোতে কলহের সৃষ্টি করি। শ্রীপ্রীতিকুমার হলে নীরবে পাশ ফিরে শুতেন। তাঁকে সাধারণতঃ কারও প্রতি সামনাসামনি বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখতাম না। যেটুকু করতেন তা জীবনের মতো। তারপর আর তাদের কোনও দিন এবাড়িতে দেখিনি।

এবার আসি ডাক-ব্যবস্থার কথায়। পার্থসারথির চৈত্র সংখ্যাও পোস্ট হয়ে গেলো, অথচ ফাল্গুন সংখ্যা এখনও ডাকে এলো না। মফস্বলের গ্রাহকেরা হয়তো বই ঠিক মতো পেয়ে যান, কিন্তু কলকাতার গ্রাহকেরা বই সময়মত পান না। হয় অনেক বই একসাথে Post হচ্ছে বলে গঙ্গার জলে ফেলে দেওয়া হয়, আর নয়ত G.P.O.-তে Stamp মারা হচ্ছে না। মোট কথা এরকম অব্যবস্থা আগে কখনও হয় নি। অথচ এত গ্রাহকদের হাতে হাতে বই দেওয়াও সম্ভব নয়। তাঁরা যেন দয়া করে ডাকঘরে একটু খবরাখবর করেন। আমাদের যে কাজটি পরম নিষ্ঠা নিয়ে করা হয়, সেটা অন্যের গাফিলতির জন্য বিঘ্নিত হবে, ভাবতে বড় খারাপ লাগে।

যাক! শ্রীপ্রীতিকুমারের জন্মদিন আমরা খুব ভালোভাবে পালন করেছি। পরিবেশটা খুব মনোগ্রাহী হয়েছিল। এই দিনটির মাধ্যমে আমরা অনেকে একসাথে মিলিত হতে পারি। ভাবের আদান প্রদান হয়। কত দিনকার সব সঙ্গীসাথী আমাদের বাড়ীতে আসেন। পরিবাশটা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি সবাই সুস্থ থাকুক। এই দিনটাকে ঘিরে আমরা আবার উৎসবে মেতে উঠি। আমার নিজের ত্রুটি গুলি অবশ্যই মার্জনীয়।

\- - - - - - - -

(** রচনাকাল – এপ্রিল, ১৯৯২)

শ্রীচৈতন্য-বাণী-আচরণে ও বচনে **ডঃ রুহিদাস সাহা**

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ১৪৮৬ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী, তিরোভাব ১৫৩৩ সালের ৯ই জুলাই - জীবনকাল ৪৭ বছর ৪ মাস ১২ দিন। প্রায় ২৪ বছর বয়সে ১৫১০ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণ, পরিব্রাজক রূপে নীলাচল, দক্ষিণ ভারত, পূর্ব ভারত ও উত্তর ভারত পরিক্রমা ছয় পঞ্জীবর্ষে প্রায় সাড়ে তিন বর্ষ ব্যাপী, শেষ অধ্যায়ে ১৮ বছর তাঁর নীলাচলে অবস্থিতি। এই মহাজীবন তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত - মানুষ গৌরাঙ্গ, ভক্ত শ্রীচৈতন্য, ভগবান শ্রীচৈতন্য। যে কোন অধ্যায়েই উপদেশ দেবার দৃষ্টান্ত স্থাপনই বহু ব্যাপক। তাই মহাজীবনকে কেন্দ্র করে সর্বজনীন প্রবাদ 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে' শিখায়। 'ধর্ম' শব্দ এখানে ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত। শ্রীচৈতন্যের জীবনই তাঁর বাণী।

কী দুরন্তই না ছিলেন বিশ্বম্ভর, বড্ড ডানপিটে ছেলে। জীবনে এমন আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে দুরন্তপনা ও চপলতাই শিশু-বালক-কিশোরের ধর্ম।

বড় ছেলে বিশ্বরূপের মত বিশ্বম্ভরও সন্ন্যাসী হয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কায় মা বাবা আদেশ দিলেন - পড়া বন্ধ। সে আদেশ অমান্য করলেন বিশ্বম্ভর, এতে প্রকাশ পেল বিদ্যাশিক্ষার প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ, আর এর মধ্য দিয়েই তাঁর উপদেশ – শিক্ষা লাভে এমন ঐকান্তিক আগ্রহ থাকাই বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া আস্তাকুঁড়ে বসে মায়ের ভর্তসনার উত্তরে মাত্র পাঁচ বছর বয়সের ছেলের মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল - ভগবান তো সব জায়গাতেই আছেন, তবে এ জায়গাই বা অপবিত্র থাকবে কেন মা?

মাতৃভক্তির অফুরন্ত খনি এই শ্রী চৈতন্য-জীবন। মায়ের আদেশেই তাঁর নীলাচলে অবস্থিতি। সন্ন্যাস গ্রহণ করেও তিনি মাতৃপদে দণ্ডবত হয়ে পড়েছেন, মাকে বুকে জড়িয়ে অঝোরে কেঁদেছেন। নীলাচলে বসে মায়ের খবর জানতে ব্যাকুল হয়েছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন – 'মাতৃভক্তগণের মধ্যে প্রভু হন শিরোমণি'।

শ্রীচৈতন্যের জীবনে অপরিসীম মাতৃভক্তি সকলকে মাতৃভক্ত হতেই শিক্ষা দেয়। রঘুনাথ দাস প্রথমে সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা নিয়ে উপস্থিত হলে তাঁকে তিনি উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন 'ঘরে ফিরে যাও, মা বাবার সেবা কর'।

গৌরাঙ্গ জীবনের পিতৃভক্তি ও ভ্রাতৃপ্রেমও সকলের অনুকরণীয়।

শ্রীগৌরাঙ্গ পারদর্শী ছিলেন লাঠিখেলায়, সাঁতারে ও খেলাধূলায়। জীবনে এসবেরও যে প্রয়োজন সে শিক্ষাই দিয়েছেন তিনি নিজের জীবনে আচরণের মধ্য দিয়ে।

প্রগাঢ় অধ্যবসায়ে যে কত বড় পণ্ডিত হওয়া যায়, কেশব কাশ্মিরীর মত পণ্ডিতকেও যে পরাজিত করা যায় বিশ্বম্ভরের জীবনই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

অস্পৃশ্যতা-অবিচার-নির্যাতন-অসাম্যের বিরুদ্ধে তাঁর আপোষহীন সংগ্রাম ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে আমাদের আপোষহীন সংগ্রামী হতেই উপদেশ দেয়।

কাজীর (অর্থাৎ ম্যাজিস্ট্রেটের) নির্দেশে নগরে নগরে কীর্তন বন্ধ, আইন অমান্যে মৃত্যুদণ্ড। নির্দেশ শুনেও শ্রীগৌরাঙ্গ অবিচল ধীর-স্থির। গভীর কণ্ঠে আদেশ দিলেন তিনি -

নগরে নগরে আজি করিব কীর্তন।
সন্ধ্যাকালে কর সবে নগর- মণ্ডন।।
সন্ধ্যাতে দেউটি সব জ্বাল ঘরে ঘরে।
দেখো কোন কাজী আসি মোরে মানা করে।।

শ্রীগৌরাঙ্গের আহ্বানে মিছিলে মিছিলে ছেয়ে গিয়েছিল সমস্ত নবদ্বীপ। জনতা হয়েছিল উদ্বেল, জয় হয়েছিল জনতার, জয় হয়েছিল জনতার প্রাণ নেতা শ্রীগৌরাঙ্গের। দেশে দেশে যুগে যুগে শাসক কর্তৃক অধিকার হরণের যে কোন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হবার, জয়লাভ করার এ এক উজ্জ্বলতম নিদর্শন।

ঠাকুর ঘরে নৈবেদ্যের অর্দ্ধেক যে থাকে না সে কাণ্ড মাগো তোমার পুত্রবধূরই - বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে লক্ষ্য করে পরিহাস ছলে একথা শচীদেবীকে

বলেছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ। আজীবন কৌতুকপ্রিয় শ্রীগৌরাঙ্গের পরিহাস-প্রিয়তা সকলকে পরিহাস প্রিয় হতেই শিক্ষা দেয়।

দরিদ্র মানুষের জন্যে অসীম সমবেদনা, অফুরন্ত করুণাধারা ছিল গৌরাঙ্গ জীবনে। তারই এক বাস্তব চিত্র প্রকাশিত হয়েছে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত 'শ্রীচৈতন্য ভাগবতে'। বৃন্দাবন দাস লিখেছেন – 'প্রভু সে পরম ব্যয়ী ঈশ্বর ব্যাভার। দুঃখিতেরে নিরবধি দেন পুরস্কার'।। তিনি আরও লিখেছেন 'দুঃখিতেরে দেখিলে প্রভু বড় দয়া করি। অন্নবস্ত্র কপর্দ্দক দেন গৌরহরি'।। আচরণের মধ্য দিয়ে তিনি এই শিক্ষাই দিয়েছেন যে, দারিদ্র্য সমাজের এক ভয়ংকর অভিশাপ, আর সমাজদেহ থেকে সেই অভিশাপ দূর করা প্রতিটি সামাজিক মানুষের অবশ্য কর্তব্য।

গৃহীদের জীবন ধারণে যে সঞ্চয়ের প্রয়োজন সে কথা তিনি বাসুদেব দত্তকে উপলক্ষ করে বলেছেন - গৃহস্থ হয়েন ইহো, চাহিয়ে সঞ্চয়। আর, রঘুনাথ দাসকে এক সময়ে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন –"যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া"। ভোগ করতে যেমন তিনি বলেছেন, সঙ্গে সঙ্গে আসক্তি পরিহার করে চলতে নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ, ভোগের আসক্তিই সমাজে নানা অনাচার সৃষ্টি করে, আসক্তিই শোষণে পর্য্যবসিত হয়। মহোৎসবের মাধ্যমে পঙক্তি-ভোজন-প্রবর্ত্তনের পশ্চাতেও রয়েছে তাঁর অর্থনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য।

দাক্ষিণাত্য পরিক্রমাকালে বাসুদেব নামে এক কুষ্ঠরোগীকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে তাকে ধীরে ধীরে রোগমুক্ত করেছিলেন। রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে ঘৃণা না করে তার রোগমুক্তির জন্যে সচেষ্ট হওয়াই তাঁর শিক্ষা।

নবদ্বীপে দুই দস্যু জগাই-মাধাই এবং দক্ষিণ ভারতে দস্যু সর্দ্দার পন্থভীল সহ অনেক দস্যুর জীবনে পরিবর্তন এনেছিলেন শ্রীচৈতন্য। তিনি উপদেশ না দিয়ে নিজের জীবনে আচরণের মধ্য দিয়ে শিখালেন – 'পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়'। দস্যু দলনের মধ্য দিয়ে তিনি আরও দেখালেন - অপরিসীম মমতা আর ভালবাসা কলুষতায় পরিপূর্ণ জীবনেও ব্যাপক পরিবর্তন আনে, উত্তীর্ণ করে পশুত্ব থেকে মহত্বে।

শ্রীচৈতন্য রঘুনাথকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন – ‘গ্রাম্য কথা না শুনিবে, গ্রাম্য বার্তা না কহিবে’। অর্থাৎ লোক নিন্দা আর বাজে কথা না বলা বা না শোনাই তাঁর উপদেশ।

শ্রীচৈতন্য জীবনে আচরণের মধ্য দিয়েই দেখিয়েছেন ‘সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই’। মানুষের মহত্ব প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন – ‘শ্রীকৃষ্ণের যতেক লীলা সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাহারই স্বরূপ’।

মানব প্রেমে পাগল শ্রীচৈতন্য মানুষের জন্যে পথে নেমে এসেছেন, অধম পতিত যাকে পেয়েছেন তাকেই বুকে তুলে নিয়েছেন। দুবাহু বাড়িয়ে হরিদাসকে বুকে তুলে নিতে গেলে হরিদাস বলেছিলেন – ‘আমি অস্পৃশ্য, আমায় ছুঁয়ো না, প্রভু’। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীচৈতন্য বলেছেন – ‘তোমা স্পর্শি আমি পবিত্র হৈতে’।

কত আন্তরিকতায় যে তিনি মানবধর্মের জয়গান করেছেন তা তাঁর নীচের বাণীতেই সুস্পষ্ট-

কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।।
নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনের অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য।।
যেই ভজে সেই বড় অভক্তহীন দ্বার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার।।

ভক্তরূপে ভগবানের জন্যে তাঁর ব্যাকুলতা আর ভগবানরূপে মানুষের জন্যে তাঁর আকুলতা সত্যই অনুপম।

শ্রীচৈতন্য বলেছেন – ‘নাম ও নামী অভেদ’। তাই তাঁর মতে ঈশ্বর আরাধনার সহজ অথচ কার্য্যকরী পথ নাম সংকীর্তন - প্রাণ খুলে ভগবানকে ডাকা। শুদ্ধা ভক্তির কথাই তিনি বারবার বলেছেন। তাঁর উপদেশ -

ধনজন নাহি মাগোঁ কবিতা সুন্দরী।
শুদ্ধ ভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি।

বৈষ্ণবের স্বরূপ কেমন হবে সে কথা বলতে গিয়ে তিনি উপদেশ দিয়েছেন-

উত্তম হইয়া বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।।

জীবকে সম্মান দিতে তিনি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উপলক্ষে বলেছেন।

বৈষ্ণবের আরও লক্ষণ হওয়া উচিত তারও এক চিত্র তিনি প্রকাশ করেছেন। বলেছেন-

সর্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে।
কৃষ্ণ ভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে।।
এই সব গুণ হয় বৈষ্ণব লক্ষণ।
সব কথা না যায় করি দিগ্‌দরশন।।
কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন।।
সর্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈক শরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত ষড়্‌গুণ।।
মিতভুক, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী।।

সন্ন্যাসীর ধর্ম সম্পর্কে নিজেকে উপলক্ষ করে তিনি বলেছেন-

আমি ত সন্ন্যাসী, আমার সমদৃষ্টি ধর্ম।
চন্দন পঙ্কেতে আমার জ্ঞান হয় সম।।

সন্ন্যাসীর ধর্ম তিনি নিজের জীবনে আচরণেও দেখিয়েছেন। ভোগ পরিহার করে তিনি চলতেন। মাথায় তেল মাখতেন না, শুকনো কলাপাতা বিছিয়ে মেঝেতে শয়ন করতেন। গার্হস্থ্য ধর্মের বিরোধী তিনি ছিলেন না। বরং গার্হস্থ্য-জীবনের পক্ষেই তিনি ছিলেন। তার প্রমাণ, কারও কারও মতে আজীবন অবধূত নিত্যানন্দ যে পরিণত বয়সে বিয়ে করে গার্হস্থ্য-জীবনযাপন করেছিলেন তার পিছনে ছিল

শ্রীচৈতন্যের নির্দেশ। তবে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করলে কঠোর সন্ন্যাস-ব্রতের পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। তাঁর নিজের আচরণ সেই শিক্ষাই দেয়। গৃহী মানুষ সন্ন্যাসীর কাছে ত্যাগই আশা করে। তা থেকে বিচ্যুতি ঘটলেই সন্ন্যাসীরা লোক-চোখে নিন্দনীয় হতে পারেন। সেই কারণেই সন্ন্যাসীর আচরণ সম্পর্কে সাবধান বাণী উচ্চারণ করে তিনি বলেছেন-

সন্ন্যাসীর স্বল্প ছিদ্র সর্বলোকে গায়।
শুভ্র বস্ত্রে মসী বিন্দু যৈছে না লুকায়।।

সিদ্ধ পুরুষের আর যে সাধনার প্রয়োজন হয় না সে কথাও বলেছেন শ্রীচৈতন্য। হরিদাস বৃদ্ধ হয়েছেন, স্বাস্থ্যও তাঁর ভেঙ্গে পড়েছে। তাই তিনি আর আগের মত জপতপ করতে পারছিলেন না। আর তাতেই তিনি বেদনাহত হয়েছিলেন। তখনই শ্রীচৈতন্য তাঁকে উপদেশ দিলেন-

প্রভু কহে বৃদ্ধ হৈলা সংখ্যা অল্প কর।
সিদ্ধ দেহ তুমি সাধনে আগ্রহ কেন ধর।।

শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত ধর্ম নীরস নয়, বরং সরসতায় পরিপূর্ণ। সে-পথের নির্দেশও তিনি দিয়েছেন নিজের আচরণে-

সব ভক্ত লইয়া প্রভু নামিল সেই জলে।
সবে লয়ে জলক্রীড়া করে কুতুহলে।।

মহতের স্বভাব কেমন হবে তারও এক নির্দেশনা তাঁর বাণীতে সুস্পষ্ট-

মহানুভবের এই সহজ স্বভাব হয়
আপনার গুণ নাহি আপনি কহয়।।
মহানুভবের চিত্তের স্বভাব এই হয়।
পুষ্পসম কোমল কঠিন বজ্রময়।।

মহৎ ব্যক্তিকে শুধু পুষ্পের মত কোমল হলেই হবে না, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁকে বজ্রের মত কঠিনও হতে হবে - এই শিক্ষাই দিয়েছেন শ্রীচৈতন্য।

শ্রীচৈতন্যদেবের অপর এক উপদেশ-

ভারত ভূমিতে হইল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক কর করি পর-উপকার।।

এই উপদেশের মধ্য দিয়ে একদিকে ভারতকে তিনি মহিমান্বিত করেছেন, অন্য দিকে কীর্ত্তিত হয়েছে পর-উপকার মহিমা। চৈতন্য চিন্তায় ভারত একটি মহান দেশ, আর পর-উপকার একটি মহৎ গুণ।

বাসনা বিদায় **অনিলবরণ**

তোমার কাছ থেকে কিছুই চাইবো না, মা। তোমার চরণতলে বসে শুধু তোমার মুখপানে চেয়ে থাকবো। তোমার করুণায় তুমি যা দেবে তাহাই নত মস্তকে গ্রহণ করবো।

তুমি রাণীর রাণী, মহারাণী! তুমি এমন ঐশ্বর্য দান করতে পারো যা দেবতাদেরও ঈর্ষা উৎপাদন করবে। কিন্তু যতই চাইবো ততই আমার দিব্য সম্ভাবনা সীমাবদ্ধ হবে। সকল বাসনার মূল উৎপাটনের মৃত্যুহীন দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করেছি, জানি তুমি আমাকে তোমার আপন পদ্ধতিতে আনন্দে পূর্ণ করবে।

এই বিশ্বে তুমিই সর্বশক্তিময়ী, ইচ্ছা করলে আমাকে দেবতাদের অপেক্ষাও অধিকতর শক্তিশালী করতে পার। কিন্তু যতই আমি বিক্ষুব্ধ হই এবং আপন সঙ্কল্প অনুযায়ী কাজ করবার প্রয়াস করি, ততই আমি অকৃতকার্য হই এবং আমার সামর্থকে সীমাবদ্ধ করি। আমার সঙ্কল্প এবং প্রয়াসকে শান্ত করবার সঙ্কল্প আমি গ্রহণ করেছি, যাতে তোমার সর্বজয়ী সঙ্কল্প আমার মধ্যে তোমার ইচ্ছামত সংসাধিত হয়।

তুমিই সত্যের প্রতিমূর্ত্তি, তুমি দিতে পার অসীম জ্ঞান যা দেবতাদেরও জ্ঞানাতীত। কিন্তু যতই আমার মন ও যুক্তির প্রয়াসে জ্ঞানার্জনের চেষ্টা করি ততই আমি সত্য সম্বন্ধে অন্ধ হই। আমার মনকে শান্ত এবং নিষ্ক্রিয় করার সঙ্কল্প আমি গ্রহণ করেছি, যাতে তুমি আমাকে তোমার নিজস্ব পদ্ধতিতে আলোময় করে তোল।

সমস্ত বাধাবিঘ্ন অপসারিত করার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছি, জানি তুমি তোমার নিজস্ব পন্থায় আমার মধ্যে কাজ করবে।

এই জগতের রূপ বদলে যায়, সতেজ হয়ে ওঠে সর্ববস্তু, সকল ঘটনা সৌন্দর্যে এবং আনন্দে পূর্ণ হয় যদি আমরা আমাদের বাসনা সমূহ থেকে মুক্তিলাভ করতে পারি এবং আমাদের অহমিকাকে অতিক্রম করতে পারি।

এই জগতের সীমাবদ্ধ আনন্দের জন্য আমরা অন্ধভাবে লালায়িত হই, আমাদের ইন্দ্রিয়গণ সর্বদা ধাবিত হয় তাদের বাসনার বস্তুকে গ্রহণ ও ভোগ করবার জন্য এবং ঐভাবে আমাদের আত্মার প্রশান্তি বিক্ষুব্ধ হয়। আত্মাই সকল আনন্দের ভিত্তি। আমাদের অহমিকার বশে আমরা সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন হই; ভ্রমের বশে আমরা আমাদের জীবনকে অহংয়ের সঙ্কীর্ণ ধারণার চারিদিকে কেন্দ্রীভূত করি; তাই আসে বিভেদ ও বিরোধ; তাই আমরা ক্রোধ বা আতঙ্কে অভিভূত হয়ে দুঃখ পাই; প্রতিদ্বন্দ্বিতা আসে, ঈর্ষাপরায়ণ হই; বিরহ বিচ্ছেদ থেকে বেদনা পাই।

আমার এই সসীম অহং যে আমার প্রকৃত আত্মা নয় তা আমাকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতেই হবে। সর্বভূতের একাত্মার সাথে আমাকে সর্বদা এক হয়ে থাকতে হবে এবং বিশ্বাত্মার অনন্ত অপরিবর্তনীয় শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। এই বাসনাত্মক জীবনই আমার প্রকৃত জীবন নয় এই উপলব্ধি আমার করতেই হবে। দিব্য জননীর প্রকৃত সন্তানের জীবন এই পৃথিবীতে দিব্য জননীর লীলার একটি অংশ মাত্র। অহমিকাশূন্য হলে সমস্ত জগতের রূপ বদলে যায় এবং এই জীবন বিরাট সৌন্দর্য এবং গভীর আনন্দে পূর্ণ হয়।

মানবের বাসনা কামনাই মানুষকে নিয়ত পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে; তাই আমাদের পদে পদে পথ ভুল হয়। কেবলমাত্র দিব্য আলো এবং দিব্য নির্দেশই আমাদের অনুসরণ করা কর্তব্য; কিন্তু আমাদের অপবিত্রতা তা হতে দেয় না।

কর্ত্তব্য কর্ম সম্বন্ধে আমাদের নানা রকমের ধারণা আছে, এবং কাজ সম্বন্ধে নানা বদ্ধমূল অভ্যাস আছে। কোন কাজ যখন করতে চাই বা কোন কর্ম পরিবর্তন করতে চাই তখন আমাদের মনে নানা যুক্তি তর্কের উদয় হয়। সুতরাং এতে বিস্মিত হবার কিছু নাই যে আমরা অনবরত বিভ্রান্ত হয়ে মিথ্যাকে সত্যরূপে গ্রহণ করি। একটি অতি সহজ এবং সাধারণ নীতি আছে যা আমাদিগকে সর্বরকমের গণ্ডগোল এবং উৎকণ্ঠা থেকে রক্ষা করতে পারে, সকল ভুলভ্রান্তি এবং দুর্ঘটনা থেকে মুক্ত রাখতে পারে; সেই নীতি হল দিব্য জননীকে সর্বতোভাবে মেনে চলা, কিন্তু মানবীয় অহমিকা তা হতে দেয় না।

অহং এবং বাসনা জয় করার নিশ্চিত পন্থা দিব্য জননী দেখিয়ে দেন। সকল সময়ে তাঁর দিকে ফিরতে হয় এবং তাঁর প্রেমে অন্তর পূর্ণ রাখতে হয়। দিব্য জননীর প্রতি ভক্তি ও প্রেমে যে আনন্দ লাভ করা যায় তার সঙ্গে তুলনাই করা যায় না সেই সমস্ত সুখের যা পাওয়া যায় স্বার্থপূর্ণ অভ্যাস এবং অহমিকাপূর্ণ বাসনার চরিতার্থতায়। তথাপি এমনি আমাদের দুর্বলতা এবং অজ্ঞানতা যে আমরা দিব্য জননীর কাছ থেকে সরে যাই এবং অহমিকাকে অনুসরণ করি। আমাদের আয়ত্তাধীন কাঞ্চন থেকে আমরা বিমুখ হই এবং বৃথা জঞ্জালের স্তূপে জড়িত হয়ে দুঃখের মধ্যে পতিত হই।

দিব্য জননীর মহান প্রেমের স্বাদ একবার যে পেয়েছে সে কখনই তাঁর কাছ থেকে সরে যেতে বা দূরে থাকতে পারে না।

দিব্য জননীর দিব্য সত্তায় আমাদের জীবন পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে, সব অপবিত্রতা থেকে আমরা মুক্ত হয়ে দিব্য প্রকৃতি এবং দিব্য জীবনে বর্ধিত হব।

রাখে হরি মারে কে?

শ্রীমতী বাণীপ্রভা মালব্য

আমাদের দেশের বাড়ী কোতুলপুর থানার অন্তর্গত একটি গ্রামে। সেখানে একটি মন্দির আছে, তাতে মা শীতলা, গঙ্গা ও মনসা দেবীর বড় মূর্তি আছে এবং সেখানে মায়ের নিয়মিত পূজা হয়। প্রতিবছর জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরার সময় তিন দিন ধরে তিন দেবীর ধূমধাম করে পূজা হয়। দূরদূরান্ত থেকে বহু লোক মায়ের দর্শন ও পূজন করতে আসেন। সেখানে তিনদিন ধরে মেলাও বসে। পুজোর দিন কয়েকটি পাঁঠা বলিও হয়। গ্রামের জমিদার, প্রধান ও তারপর পাঁড়ে ঠাকুরের মানে আমাদের পাঁঠা বলি হয়। শেষে গ্রামের বাকী লোকেদের। এটাই ছিল তখনকার নিয়ম। ঐ প্রসাদ ঘরে ঘরে বিতরণ করা হতো। জাগ্রত দেবী মা শীতলার আশীর্বাদ দেওয়া ছিল – "আমার মৌজার সন্তানদের ওপর সর্বদা আমার কৃপা থাকবে। এ রোগজনিত কষ্ট কখনো কাহারো কোনদিন হবে না, তবে বাইরে থেকে আনলে আমার কিছু করবার থাকবে না।" মায়ের আশীর্বাদে সবাই সুখে দিনযাপন করে। পুরুষানুক্রমে এই ধারাই চলে আসছে।

একবার টাউনে মামা বাড়ী থেকে বাসে করে মা দেশের বাড়ী ফিরছিল। পথে এক সহযাত্রী মহিলা মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল – "মা, তোমার ওপর মনে হচ্ছে মায়ের কৃপা হয়েছে।" স্বভাবতই মা চমকে উঠলেন। নিজের স্টপেজে না নেমে পরের স্টপেজে মায়ের মন্দিরের সামনে নেমে মায়ের উঠোনে গড়াগড়ি দিয়ে প্রার্থনা করতে লাগলেন, "মা, আমার যা ভুল হয়েছে, ক্ষমা করে আমাকে উদ্ধার করো মা! ছোট ছোট তিনটি বাচ্চা নিয়ে একা ঘরে আমি কি করব মা, তুমি রক্ষা করো।" এইভাবে কিছুক্ষণ প্রার্থনা করে আমাদের নিয়ে মা ঘরে ফিরে এলো। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখা গেলো মা সব ঠিক করে দিয়েছেন। এমনি মায়ের মহিমা ! যতদিন গ্রামে ছিলাম মায়ের পুজোতে সবাই থাকতাম। কলকাতায় আসার পর বাবা প্রতিবছর দশহরার সময় গিয়ে মায়ের পুজো দিয়ে আসতো। আমরা প্রসাদ পেতাম ।

তারপর কয়েকটা বছর পার হয়ে গেছে। আমরা কলকাতায় থিতু হয়েছি। একটা ভালো স্কুলে ক্লাস সিক্সে পড়ি। সব যথাযথ চলছিল। একদিন বসন্তকালের শেষে আমার মুখে মায়ের অলংকার দেখা গেল। বাবার এক বন্ধু রতন কাকুর সঙ্গে আমাদের ফ্যামিলির ডাক্তারকে দেখাতে গেলাম। বাড়ী থেকে অনেকটা দূর হলেও পায়ে হেঁটে গেছিলাম। ডাক্তার কাকু দেখে পুষ্টি করে দিলেন। এক ডোজ ওষুধ মুখে দিয়ে বললেন, "বাড়ী নিয়ে যান, যেভাবে বলেছি ওষুধ দেবেন, নিয়ম মত চলবেন।" এবার কাকুর কাঁধে মাথা রেখে তোয়ালে ঢেকে বাড়ী এলাম। তারপর মায়ের দেওয়া অলংকারে সারা শরীর শোভিত হল। অনেকে বলল, "ওষুধ করো না, মাকে ডাকো!" কিছুদিন তাই চলার পরে অলংকারের ভার বইতে কষ্ট হচ্ছে দেখে সবাই ঠিক করল হোমিওপ্যাথি করা চলবে। কাছাকাছি এক পরিচিত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার জেঠু নিয়মিত এসে দেখতে লাগলেন। আমার কষ্ট কম-বেশি চলতেই লাগলো। খুব কাহিল হয়ে গেলাম। নিয়ম করে নানারকম ফল কেটে মা-বাবা খাওয়াতো। একদিন বলে ফেলেছিলাম - "অসুখ করলে খুব ফল খাওয়া যায়, তাই না?" শুনে মা-বাবা কাতর স্বরে বলল, "বেটা, তুই ভালো হয়ে যা আগে, যত বলবি ফল খাওয়াবো, তার জন্য রোগে পড়ার কি দরকার?"

আমার অবস্থা দেখে ডাক্তারও যেন ভরসা হারাচ্ছেন। একদিন বলেই ফেললেন - "আমি যেন আর ভরসা পাচ্ছি না। যদি সুস্থ হয়েও ওঠে তবে আপনার গৌরবর্ণা মেয়ে অবশ্যই কালো হয়ে যাবে এবং হাঁটু ভাঙ্গা এক ঢাল চুলও থাকবে না। শুনেই বাবা-মা দুজনেই 'মাগো, রক্ষা করো' বলে কেঁদে ফেললেন। দু-আড়াই মাস বিছানায় পড়ে একদম বিছানায় মিশে গেছিলাম প্রায়। মা সহ্য করতে পারছে না, কিন্তু মা তো মা, আসতেই হবে কাছে। সবসময়েই তাই জন্য নিমপাতার হাওয়া দিত মা, যাতে ভালো লাগে।

এইভাবে জ্যৈষ্ঠ দশহরার সময় এসে গেল। বাবা বললেন, "আমি যাচ্ছি মায়ের কাছে। বলবো, মা, এ তোর কেমন ছলনা! তুই না আশীর্বাদ দিয়েছিলি, কি

হল তোর আশীর্বাদ? আমার মেয়েকে তোকে ভালো করে দিতেই হবে। দেখি তুই কেমন মা।"

বাবা দেশে গিয়ে চোখের জলে মায়ের পুজো দিলেন। এদিকে আমি যতটুকু পারি চোখ খুলে মাকে কাছে না পেয়ে এদিকে ওদিকে দেখছি। ততক্ষণে মা এসে আমাকে দেখে খুব খুশি হয়ে বলল – "বেটা, তুই আজ তিনদিন পরে চোখ খুললি! জয় হোক মা তোর।" তারপর বললেন – "তুই ঘুমোচ্ছিলি দেখে একটু ওদিকে গেছিলাম বেটা।" আমি বললাম – "কই তুমি তো কোথাও যাওনি মা! তুমি তো কি সুন্দর লাল পাড় সাদা শাড়ি পরে আমার কাছে বসে আমার মাথায়-মুখে-শরীরে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলে। আমার খুব ভালো লাগছিল। তাইতো তোমায় দেখবো বলে চোখ খুলেছি মা!" মায়ের আর বুঝতে কিছুই বাকী রইল না। মায়ের উদ্দেশ্যে দুই হাত জোড় করে চোখের জলে মায়ের অভিষেক করলেন। পরেরদিন বাবা প্রসাদ নিয়ে ফিরে এলেন। তখন আমি আরও একটু সুস্থ হয়েছি। বাবা এসেই সব শুনে আমাকে আদরে আদরে ভরিয়ে দিলেন – 'মা-মা' বলে!

তারপরে আমি খুব তাড়াতাড়ি একদম সুস্থ হয়ে উঠলাম। মায়ের আশীর্বাদে আমার একটা চুলও ওঠেনি। আর গায়ের রঙ কালো সে তো অনেক দূর, কোথাও একটা অলংকারের দাগ পর্যন্ত ছিল না। এমনি মায়ের কৃপা পেয়েছিলাম। সেদিন লাল পাড় শাড়ি পরে আমার শিয়রে যিনি বসেছিলেন তিনি যদি আমার মা না হন, তাহলে তিনি কে সহজেই সহজেই অনুমান করা যায়। তিনি আমাদের সেই মা।

প্রতিদিনের পূজাতে আমি মাকে স্মরণ করতে ভুলি না। তাছাড়া তিনি আমাদের গৃহদেবী। মায়ের আশীর্বাদের হাত সবার উপরে থাক! এরপর আমি বলবো – "রাখে মা, মারে কে?" আর সবাই বলুক – "রাখে হরি, মারে কে?"

রামপ্রসাদের ইষ্টদেবী শ্যামা মা। এক রাত্রে প্রবল ঝড়ে রামপ্রসাদের ঘরের বেড়া ভাঙ্গিয়া পড়ে। রামপ্রসাদ নিজেই বেড়া বাঁধিতে বসিলেন। কনিষ্ঠা কন্যা জগদীশ্বরী খুঁটি ফিরাইয়া দিয়া পিতাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। খেয়াল খুশি মত চঞ্চলা বালিকা চলিয়া গিয়াছে। হাতের কাজ আর মাতৃসঙ্গীতে সাধক তন্ময়। ইত্যবসরে ধ্যানের ঠাকুরাণী ভক্তের ভক্তির টানে কন্যারূপে অবতীর্ণা হইয়া ভক্তের কাজ শেষ করিয়া আবার অন্তর্হিতা হইলেন। এখানে ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে যে ভক্তের ঐকান্তিক ভক্তির আকর্ষণে ব্রহ্মময়ীকে সাকাররূপ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

ভক্তসাধক গোস্বামী তুলসীদাসের জীবনীতে দেখি তাঁহার রচিত অপূর্ব্ব গ্রন্থ রামচরিত মানসের পাণ্ডুলিপি চুরি করিতে কাশীর একটি কুখ্যাত চোর তাঁহার আশ্রমে প্রবেশ করিতে গিয়া দেখে এক দিব্যকান্তি শ্যামল কিশোর ধনুর্ব্বাণ হাতে আশ্রমের চারিদিকে ঘুরিয়া পাহারা দিতেছেন। চোরটি পরদিন এ কাহিনী ভক্তসাধককে বিদিত করিলে তিনি অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিয়া ছিলেন ঐ তেজোপূর্ণ কলেবর দৈবকান্তি পাহারাদারটি তাঁহারই প্রভু রঘুনাথ।

বহু বিশ্রুত তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষ বামাক্ষেপার জীবনীতে দেখি তাঁর ইষ্টদেবী তারাপীঠের তারামা নাটোরের রাণীকে স্বপ্নযোগে জানান মন্দিরের পুরোহিত এবং দারোয়ান নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করেছে তার প্রিয়তম ভক্তকে। এ আঘাত পড়েছে তারাপীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর অঙ্গে। তাঁর আদেশেই সে নিবেদিত ভোগ গ্রহণ করেছিল, যার জন্য চারদিন তাকে প্রসাদ দেওয়া হয় নাই। সুতরাং তিনিও উপবাসী। আর একবারের ঘটনা- একদিন ভাবোন্মত্ত অবস্থায় ক্ষেপাবাবা বিগ্রহের গায়ে মূত্র ত্যাগ করেন। এ বারেও আসে মায়ের প্রত্যাদেশ। তারাপীঠে কর্তৃপক্ষ সংবাদ পাঠান মায়ের পূজা পূর্ব্ববৎ চলিবে, দেবীবিগ্রহ অপবিত্র করার প্রশ্ন উঠে না, মায়ে পোয়ের ব্যাপারে অপরের মাথা ঘামাইবার দরকার নাই।

শুদ্ধ সত্ত্ব অপাপ বিদ্ধ সাধক রামকৃষ্ণের জীবনীতে দেখি রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ইষ্টদেবী ভবতারিণীর সঙ্গে তাঁর একাত্মবোধ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। বৈধী ভক্তির বাঁধন, পূজা ভোগ রাগের নিয়ম কানুন শিথিল হইয়া পড়িল। কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ গেল। রাণী রাসমণি এবং তাঁর জামাতা মথুরবাবু উপলব্ধি করিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ এক অদ্ভুত প্রেমভক্তি এবং ভাবতন্ময়তায় বিভোর। ইষ্টদেবী নানাভাবে তাঁহাকে দর্শন দিতেছেন এবং প্রেরণা নির্দেশও দিতেছেন। আদেশ প্রচারিত হইল তাঁর কাজে কেহ বাধা না দেন। এই সময়ে ভবতারিণীর কৃপাতেই শরণাব্রত ভক্ত তন্ত্রসাধনের এবং ব্রহ্মজ্ঞানের গুরু বিনা প্রচেষ্টায় প্রাপ্ত হন।

সাধক কমলাকান্ত তন্ত্রসাধকের ইষ্ট দেবী বিশালাক্ষী। শক্তিধর তন্ত্র সাধক রাতদিন দেবীর মন্দিরে পঞ্চমুণ্ডীর আসনে সাধনায় মগ্ন, খাওয়া দাওয়ার ভাবনায় পত্নী চিন্তান্বিতা। এই সঙ্কট সময়ে দুইটি পরিচারক সঙ্গে লইয়া এক শ্যামবর্ণা লাবণ্যময়ী কিশোরী বহু খাদ্যবস্তু পূর্ণ দুইটি চাঙ্গাড়ি দিয়া গেলেন।এই ঘটনাটি তাঁহার ইষ্টদেবীর কিশোরীর ছদ্মবেশে এক স্নেহলীলা। আর একদিনের কথা, দেবীর সেবার প্রাচীন প্রথানুযায়ী রাত্রিতে মৎস্য রন্ধন করিয়া ভোগ দিতে হয়। একদিন গভীর নিশীথে ধ্যান টুটিয়া মৎস্যের অভাবজনিত বিঘ্ন তার প্রাণে বাজিয়াছে। হঠাৎ জগজ্জননী বাগদীনারীর ছদ্মবেশে একজোড়া মাগুর মাছ দিয়া গেলেন। আরও একদিন জগজ্জননী গোয়ালিনীর বেশে আসিয়া কমলাকান্তের আবেগভরা গান শুনিয়াছিলেন।

উপরোক্ত উদাহরণগুলি হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে ভক্ত সাধকদের সহিত জগন্মাতার আত্মিক যোগাযোগের মধ্য দিয়া এক অচ্ছেদ্য বন্ধন গড়িয়া উঠে। ইষ্টের সঙ্গে হয় একান্তবোধ। মৃন্ময় বিগ্রহ তখন চিন্ময় মূর্ত্তিরূপে আত্মনিবেদিত সাধকের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনিই আবার স্থূলদেহ পরিগ্রহ করিয়া সাধককে দর্শন দেন। পরমহংসদেব এই প্রসঙ্গে একটি চমৎকার উপমা দিয়াছেন। তিনি বলেছেন সমুদ্রের জল অসীম অনন্ত, কিন্তু হিমে কোথাও কোথাও বরফরূপে

সাকার হয়, সেই রকম ভক্তের প্রেম ভক্তির টানে ভগবান সাকার রূপে ভক্তকে দর্শন দেন। সেই অন্তর্যামীই আবার সূক্ষ্ম রূপে অন্তরে প্রেরণা নির্দ্দেশও দেন। ইষ্ট এবং তাঁর প্রতি নিবেদিত ভক্তের ভিতরে দেওয়া নেওয়ার কাজ চলিতে থাকে এক দুর্জ্ঞেয় চিরন্তন ঐশী নিয়মে।

দীঘায় শিক্ষক সম্মেলন **শ্রী অরূপ কুমার ভট্টাচার্য**

প্রথমেই বলে রাখি আমি কিন্তু দীঘাকে কেন্দ্র করে কোনও ভ্রমণের গল্প লিখতে বসিনি। ১৯২৬ সাল থেকে ‘পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির’ (WBCUTA) যে পথ চলা শুরু হয়েছিল, তার বর্ষব্যাপী শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের ৯৬ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (বার তিনেক হতে পারে নি) যেহেতু নিউ দীঘার জাহাজবাড়ি অর্থাৎ দীঘা–শঙ্করপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (DSDA) হল ঘরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাই ৯ই আর ১০ই আগস্টের দুটো দিন আবার আলাপ জমাতে গেছিলাম বহু পরিচিত সমুদ্র-শহর দীঘার সাথে। কোথায় থাকব জানতাম না, তবে পূর্ব মেদিনীপুরের শাখা সংগঠন আর আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যে ভালো ব্যবস্থাই করবে সে ভরসা ছিল। ভাবনাটা অন্য জায়গায়। ১৮০০ অধ্যাপক যেখানে নিবন্ধিত হয়েছেন, দীঘার দুয়ারে তার অর্ধেকও যদি উপস্থিত হন সমস্যা হবেনা? বলতে নেই, প্রথম দিন প্রায় ৮০০ আর পরদিন রবিবার আরও শ’দুয়েক ডেলিগেট্স্ আসলেও থাকা-খাওয়ায় কোনও খামতি ছিল না। এর একটা কারণ যদি Hotel Jairam Way-Bay’র ১৭৩টা ঘর বুক করা হয়, অন্যটা স্থানীয় ডেলিগেটসদের সংখ্যা। তাদের রাতের ঠিকানা তো দীঘার হোটেল ছিলো না।

টিকিট ছিল ১২৮৫৭ তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেসের। সকাল ৬টা ৪৫-এ হাওড়া ছেড়ে পৌনে ৮টা নাগাদ মেচেদার চপ সিঙ্গাড়ায় খিদেটাকে জিইয়ে রেখে ১০টা

০৫-এ দীঘা পৌঁছে যেতাম, যেখান থেকে জাহাজবাড়ি মিনিট পাঁচেকের হাঁটা পথ। কিন্তু গত কয়েকদিনে ট্রেনের খামখেয়ালিপনা অন্যরকম ভাবতে বাধ্য করেছিল। গড়ে প্রতিদিন যেখানে ট্রেন পাঁচ সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা দেরীতে ছাড়ছে আর ঘরের কাছেই বেলঘরিয়া ডিপোর সরকারি বাস সাড়ে চার ঘণ্টায় যখন দীঘা পৌঁছে দেবার টাইম টেবিল দেখাচ্ছে তখন তো একটা টিকিট কাটাই যায়! অন-লাইনে টিকিটটা অবশ্য কেটেছিল শ্রীশ চন্দ্র কলেজের ভ্রাতৃপ্রতিম অধ্যাপক কার্তিক চৌধুরী, যে কিনা নিজেও যাচ্ছিল ৯ তারিখের সাড়ে ৬টার বাসে। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি শনি, রবি অথবা ছুটির দিন না হলে আগে থেকে দীঘার টিকিট কাটার দরকার পড়ে না। সকালের দিকে মিনিট ১৫ অন্তর যেহেতু বাস ছাড়ছে, সিট পেতে কোন অসুবিধে হয় না। বাস মোটামুটি সময়ে ছাড়লেও মেচেদার চপ-মুড়ির পর তার চাল চলন মোটেই সুবিধার নয়। হাত দেখলেই থামা আর টাকার বিনিময়ে টিকিট না দেওয়া এ পথের সাধারণ প্র্যাকটিস। বোঝাই যায় এতো যাত্রী হওয়া সত্ত্বেও সরকারি পরিবহন সংস্থার অর্থনৈতিক দুর্দশার কারণ কি। কার্তিকের সাথে শ্রীশ চন্দ্র কলেজের আরও দুই অধ্যাপক কৌশিক আর বিদ্যুতের ফোন চলাচলি চলছিল। ওদের ভাগ্যবান বলতে হবে কারণ খেয়ালি তাম্রলিপ্তে চেপেও ওরা সেদিন দীঘা পৌঁছে গেছিল আমাদের অন্তত দেড় ঘণ্টা আগে। তাতে অবশ্য আমাদের সুবিধাই হয়েছিল। আগে পৌঁছোবার সুবাদে হোটেল জয়রামে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় কুপন ওদের হাতে এসে গেছিল।

সাড়ে এগারোটা নাগাদ নিউ দীঘা বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে দীঘা বর্ডারের দিকে মিনিট পাঁচেক হাঁটলেই বাঁ দিকে DSDA-র বিশাল জাহাজ বাড়ী। ভিতরের হলে তখন কি হচ্ছে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় ছিল না, দরকার ছিল নির্দিষ্ট কাউন্টারে মানি রিসিট দেখিয়ে ব্যাগ আর তিনবেলা খাওয়ার কুপন জোগাড় করা। প্রাথমিক কাজকর্ম মিটে যাওয়ার পর লুচি আলুর দম আর গোলাপজামে মেচেদার চপ মুড়ি ভরা পেটটাকে আরেকটু ভরিয়ে ফোন করি শ্রীশ চন্দ্র কলেজের আরেক অধ্যাপক কৃষ্ণপদ দাসকে। অর্গানাইজারদের একজন হওয়ায় অবসরপ্রাপ্ত আমার সাথে

কলেজের মোট পাঁচজনের ঘরের ব্যবস্থা করে রাখতে ওর কোন অসুবিধাই হয় নি। আগেই বলেছি জয়রাম ওয়ে-বে হোটেলের এন্ট্রি কুপন ছিল কৌশিকের কাছে, তার থেকে সেটা সংগ্রহ করে আমি আর কার্তিক ৫০ টাকায় টোটো বুক করে চলে আসি প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে হোটেল জয়রামের দরজায়। দুইটি সুইমিং পুল সহ ১৭৩টি ঘর নিয়ে চার ব্লকে বিভক্ত হোটেল জয়রাম আক্ষরিক অর্থেই বিশাল। রয়েছে রেস্টুরেন্ট, ইনডোর গেমস, ফ্রি ওয়াই ফাই, স্পা এবং Jacuzzi বাথের ব্যবস্থা, এবং অবশ্যই দোলনা সহ শিশুদের পার্ক। সমস্যা একটাই, জাহাজ বাড়ী থেকে সমুদ্র যে দিকে, হোটেলের অবস্থান ঠিক তার উল্টো দিকে। অর্থাৎ হোটেলের বারান্দা থেকে সুইমিং পুল দেখতে পেলেও ঢেউয়ের উচ্ছ্বাস দেখার কোন সম্ভাবনাই নেই যেমনটি আছে ওল্ড দীঘার ব্লু ভিউ অথবা নিউ দীঘার সাগর প্রিয়া অথবা বীচ ভিউ থেকে। আমাদের জন্য A-ব্লকের যে G-02 ঘর নির্দিষ্ট ছিল তিন শয্যার সেই ঘরে আমরা খুব বেশি সময় ছিলাম না। পিঠের রাকস্যাকটা নামিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিষগুলো এখানে পাওয়া নতুন ব্যাগে ভরে দরকার ছিল ক্লান্ত শরীরটাকে একটু গরম জলে সেঁকে চাঙ্গা হয়ে ওঠার। সে পর্ব মিটে যেতেই আবার আমরা জাহাজ বাড়ীতে। বাহন যথারীতি মাথাপিছু ২০ টাকার টোটো। যার ভাষণ শোনার জন্য সত্যিকারের আগ্রহ ছিল তিনি অধ্যাপক শোভনলাল দত্তগুপ্ত। কিন্তু মন দিয়ে তার কথা শুনতে পেলে তো! জানি না কতটা পলকা ছিল কাপড়ে ঢাকা প্লাস্টিকের চেয়ারগুলো। কিন্তু একের পর এক চার চারটে চেয়ার ভেঙ্গে পড়ায় অনেক কথাই হারিয়ে গেছিলো কিছুক্ষণের হট্টরোলে। তবু ভাগ্যি চেয়ার ভাঙলেও কারও কোমর ভাঙ্গেনি। শোভনলাল বাবুর বক্তব্য শেষ হওয়ার পর লাঞ্চ ব্রেক। মেনুতে ইলিশ আশা করলেও পরিবর্তে ছিল পমফ্রেট। তবে ভাত, ডাল, সবজি, ভাজি, আর চাটনি পাঁপড় মিলে মোটের ওপর খাওয়াটা ভালোই ছিল। লাঞ্চের পর সেমিনার - ‘বর্তমান ভারতে শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্কট’। অবশ্য সেমিনার চলতে থাকলেও শেষ রাত থেকে ছোটাছুটিতে ক্লান্ত শরীরটা ভাতঘুমের জন্য একটা বিছানা খুঁজছিল। অতএব শিক্ষাকে সঙ্কটে রেখেই ফিরে চলি জয়রামের নির্দিষ্ট ঘরে – তলিয়ে যাই গভীর ঘুমের দেশে।

ঘুম ভাঙলো কার্ত্তিকদের ডাকাডাকিতে। শুনলাম কৃষ্ণপদ তার WagonR নিয়ে অপেক্ষা করছে। প্রথমেই দীঘা বর্ডারের কাছে এসে বাঁয়ের রাস্তা ধরে পৌঁছে যাই উদয়পুরের সি-বীচে। কয়েক বছর আগের নির্জনতা শনিবারের বিকেলে না থাকলেও দীঘার তুলনায় ভিড় তো কম বটেই। এর আগে যখন উদয়পুরে এসেছি কোনও পার্কিং ফি দিতে হয়েছে বলে মনে পড়েনা। এখন দেখলাম সবখানেই ফেউ জুটেছে। আমার ২৭ বছর NCC তে থাকায় অর্জিত আর্মি কার্ডের দৌলতে ফি কিছুটা কমলো বটে, পুরোপুরি মকুব হল না। অথচ ঝাড়খণ্ড সমেত ভারতের বহু জায়গায় এই কার্ডের কল্যাণে আমরা ছাড় পেয়েছি। বলার কিছু নেই। আজকের বাঙলায় এটাই দস্তুর। সূর্য ডুবতে তখনও অনেক দেরী, তাই গাড়ি চললো চন্দনেশ্বর মন্দিরকে ডাইনে রেখে তালসারির সমুদ্র বীচের দিকে। মন চাইলেও শ্রাবণ মাসের রাখী-পূর্ণিমার সন্ধ্যায় মন্দিরে প্রবেশের উপায় ছিল না, তাই শনি সন্ধ্যায় দেবতাকে প্রণাম জানিয়েছি মন্দিরের বাইরে থেকেই।

তালসারিতে আগে ঝাউবন সমেত চওড়া সমুদ্র সৈকত দেখতে পাওয়া গেলেও এখন বালিতে পা রাখা ভাগ্যের ব্যাপার। জোয়ারে সমুদ্রকে দেখতে হয় বাঁধানো ঘাট থেকেই। তার সাথে ঘনিষ্ঠতা শুধু মরা কোটালেই সম্ভব। আমাদের কপাল ভালো ভাঁটার সন্ধ্যায় সমুদ্র তার ঘোমটা খসিয়ে বালির বুক মেলে দিয়েছিল পর্যটকদের কাছে টানতে। উচ্ছ্বল যৌবনবতী হয়তো সিনিয়র সিটিজেনদের দুরে রাখতেই কাছে যাওয়ার পথটা অনায়াসসাধ্য রাখেনি, তবে সাথের সাথী চার জন যখন সরু সিঁড়ি ভেঙ্গে বালির বুকে পা রাখলো, বয়সের দোহাই দিয়ে আমিও কিন্তু পিছিয়ে থাকিনি। তবে খুব বেশি ঘনিষ্ঠতা করার উপায় নেই, মাঝখানে জলের ধারা পথ আটকে দাঁড়িয়ে। এদিকে ডুবন্ত সূর্যকে দেখার আগ্রহে খেয়াল করিনি জল ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। স্বাভাবিক ভাবেই পর্যটকের দল ছুটছে যাতে সিঁড়ি ভেঙ্গে বাঁধানো ঘাটে উঠে পড়া যায়। বিলম্বে বালি আর সিঁড়ির মাঝখানে জলের প্রবাহ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সকলেই নির্বিঘ্নে উপরে উঠে এসেছিলো, তবে বেণী না ভিজলেও জুতো ভিজেছিল অনেকেরই।

তালসারি থেকে জাহাজবাড়ির ফিরতি পথটাই এবারে সবচেয়ে রোমাঞ্চকর হয়ে গেল, চেনা পথে না ফিরে তরুণদলের সাথে বনপথের মজায় মজতে গিয়ে। ঘনিয়ে আসা সন্ধ্যায় কিঞ্চিৎ অ্যাডভেঞ্চারের লোভেই হয়তো হারিয়ে গেছিলাম অন্ধকারের অন্তরালে। কাজুবাদামের বাগানের মধ্যে দিয়ে সরু কাঁচা পথ যে আমাদের কোন ঠিকানায় নিয়ে যাচ্ছিল তা কে জানে? অন্ধকারে চেনা পথও কেমন অচেনা হয়ে যায়, তার উপর গুগল বাবাজি-ও ডাহা ফেল! এ যেন পঞ্চপাণ্ডবের বনবাস! তবে এ তো আর চাঁদের পাহাড়ের পথ নয়, ঘন বসতি থেকে বড় জোর এক কিলোমিটারের মধ্যে, তাই পেটের মধ্যে খাই খাই রব উঠলেও মন বলছিল – চল যাই! শেষ পর্যন্ত অন্ধকারের বন্ধু হিসেবে পেয়ে গেলাম জনৈক স্থানীয় অধিবাসীকে। আর আমাদের পায় কে? সোজা জাহাজ বাড়ির চা সিঙ্গাড়ার আসরে।

আগেই বলেছি সে রাতটা ছিল রাখী পূর্ণিমার। তাই সাথের সাথীরা চাইছিল পুরানো দীঘার সমুদ্র তীরে বিশ্ববাংলাকে ক্যামেরায় রেখে আকাশের চাঁদ দেখতে। কৃষ্ণের গাড়ির কল্যাণে নতুন থেকে পুরানো দীঘার পথের বাঁ দিকে নতুন জগন্নাথ মন্দিরের দরজায় ভক্তের ভিড়ও দেখা হয়ে গেলো। সমস্যা এলো তার পরেই। গাড়ির চাকায় হাওয়া কম এরকম একটা সন্দেহ ছিলই, পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেল সামনের দিকে ডাইনের চাকার প্রায় দশমী দশা। চাঁদ দেখা তখন মাথায় উঠেছে। ছুটতে হল আবার দীঘা-বর্ডারের দিকে। নতুন টায়ারের দোকানটা যে ওখানেই! স্টেপনি দিয়ে একটা দিন যে চালিয়ে নেওয়া যেতনা এমন নয়, কিন্তু কাল সকালে বাকী চার জনের আবার শঙ্করপুর, তাজপুর সহ মন্দারমণি বেড়াবার পরিকল্পনা! তাই সমুদ্র সাক্ষী করে চাঁদের হাসি না দেখতে পেলেও আগামী কালের সমুদ্র সকাল ওদের জন্য কনফার্মড। আর আমি? রাতের ডিনারে চিকেন কারির সাথে যতই পরদিন লাঞ্চে মাটন কষার গল্প শোনানো হোক, সকাল ১০ টা ৩৫-এর ১২৮৫৮ তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেসের ফিরতি টিকিট এবার আর নষ্ট করছি না। তবে দলের বাকী সদস্যরা সাত সকালে মন্দারমণি রওনা হয়ে যাওয়ার পরেও তো নিজের

জন্য ঘন্টা তিনেক সময় আমার থাকবে। সেই সময়ে অন্তত ষাট বছরের পরিচিত চির সুন্দরী দীঘার সাথে আরেকবার আরেকটু ঘনিষ্ঠ হব না?

DSDA

তালসারি

হোটেল জয়রাম

জগন্নাথ মন্দির, দীঘা

স্বগতোক্তি **সুনন্দন ঘোষ**

কেটে গেলো প্রায় চারটে দশক। ১৯৮৬-র ২৪শে নভেম্বর বিকেল সাড়ে চারটের অশ্রুজল আজও শুকোয়নি। তারুণ্যের রোমাঞ্চে জলের বুকে যে রোদের আলপনা দেখে খুশিতে আকুল হতাম, জীবনের নিষ্ঠুরতম বিচ্ছেদের ঐ দিনটায় মাথার উপর থেকে ছাদটা হঠাৎ সরে যাওয়ার পরে তারই তাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে ছুটোছুটি করে মরেছি বছরের পর বছর। বাদল দিনে ছুটির খেয়ালে যে জলে কাগজের নৌকো ভাসাতাম – দুয়ার ভেঙ্গে সেই জল প্লাবন হয়ে এসেছে – জীবনের অভিধানে সংগ্রাম শব্দটা নিঃশব্দে যোগ হয়ে গেছে। ক্ষতি যা -- সে তো সারা জীবনের, লাভ শুধু নিজেকে চিনতে শেখা, নিজেকে বুঝতে শেখা। সত্যি বলতে কি, দুঃখের মন্থনে অমৃত আহরণের শিক্ষাও এতো জরুরী তা তো ভাবিনি কখনও। অহঙ্কার কোন মাত্রায় বিগলিত হলে আত্মবিশ্বাস হয় – বুঝতাম না। অবিশ্বাস কোন পর্যায়ে পৌঁছে সমর্পণ হয় – জানতাম না। প্রতিটা মুহূর্তে আজও শিক্ষানবিশি। নতুন রূপে দেখা, নতুন ভাবে দেখা।

ত্রুটি অনেক! কিছুর বিশ্লেষণ হয়, কিছু মোহের আড়ালে হারিয়ে যায়। তবু ভালও কি নেই কিছুই? আছে তো। তাই আমি, তুমি, তিনি – সবাই মিলে "আমরা" হয়ে আছি।

সত্যের একপাশে থাকে মুক্তি, অন্যপাশে বন্ধন। দুই-ই সত্য। গর্ভ ছিঁড়ে জাতকের আসার সময় চারিপাশে শঙ্কা থাকে, থাকে স্বেদ, রক্ত, অশ্রুজল। ক্ষত নিরাময় হয় সময়ের ব্যবধানে। শরীরের মোড়কে লুকিয়ে থাকা অবয়ব ক্রমে রূপ পায়, নাম পায়, বিশ্বাস পায়।

সেও নবজন্ম। শরীরী স্নেহের আবরণ ঘুচিয়ে ঐশী আশীষের আনন্দে পথ চলা। কাগজের নৌকো নয় আর – জীবনের নৌকোটাকেই ভাসানো। আলোয় নিশায়, তৃপ্তিতে তৃষায় পাড় খুঁজে খুঁজে ফেরা।